বাংলাদেশে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সম্ভাব্য পথসমূহ অনুসন্ধান

ব্রিফিং পেপার

ফেব্রুয়ারি ২০২৫

REDRESS
Ending torture, seeking justice for survivors

blast
ব্লাস্ট

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং রিড্রেস জুলাই ২০২৪ থেকে শুরু হওয়া বাংলাদেশের সংকট মোকাবিলায় নির্যাতনের জন্য জবাবদিহিতা ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে আইন ও নীতিগত সংস্কারের উদ্যোগ নিচ্ছে এবং ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণে প্রবেশাধিকার জোরদার করতে কাজ করছে। এই প্রকাশনাটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে এবং United Against Torture Consortium (UATC) উদ্যোগের আওতায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এর বিষয়বস্তুর পূর্ণ দায়ভার রিড্রেস ও ব্লাস্টের; এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতামত প্রতিফলিত করে না।

UNITED AGAINST TORTURE

Funded by the European Union

ভূমিকা

জুলাই–আগস্ট ২০২৪ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত সংকটকালে বিক্ষোভ দমনের নামে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে—যার মধ্যে ছিল ব্যাপক নির্যাতন ও নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং ইচ্ছামতো গ্রেপ্তার ও আটক[1]। এসব ঘটনা দেশের দীর্ঘদিনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাসকে আবারও সামনে এনে দেয়। এটি স্পষ্ট করে যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার চর্চায় নির্যাতন ও নিপীড়ন একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যাপক সমস্যায় পরিণত হয়েছে[2]। ২০২৪ সালের সংকটের পর নির্যাতন ও অন্যান্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের জন্য জবাবদিহি ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে গিয়ে ভুক্তভোগী, নাগরিক সমাজের সদস্য এবং রাজনৈতিক কর্মীরা যে সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন, তা জবাবদিহি ও ক্ষতিপূরণ দাবির অগ্রগতির পথে বিদ্যমান প্রধান আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতাগুলোকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের অঙ্ক সম্পর্কে স্বচ্ছতার অভাব এবং এমন একটি বিচারিক প্রক্রিয়া, যা প্রায়শই অপরাধীদের দায়মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। এসব কারণে অনেক ভুক্তভোগী সরাসরি আইনি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে কিংবা প্রাথমিকভাবে পুলিশের কাছে অভিযোগ দিতেও অনীহা বোধ করছেন—যা এক ধরনের ভীতিকর বা নিরুৎসাহজনক প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

২০২৪ সালের ঘটনাবলির পর একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়া, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আইন ও নীতিগত সংস্কার প্রবর্তন (যেমন ফৌজদারি কার্যবিধিতে সংশোধনের মাধ্যমে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা)[3], এবং ভবিষ্যতে আরও সংস্কারের সম্ভাবনা—এমনকি অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদের বাইরেও—পরিবর্তন বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এসব সংস্কার নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণের শিকার ব্যক্তিদের ওপরোক্ত কিছু প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সহায়তা করতে পারে এবং তারা যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন তার জন্য অর্থবহ জবাবদিহি ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পথ খুলে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘের বিশেষ প্রক্রিয়াসমূহ (UN Special Procedures) এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ও বাস্তব তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধান (findings of fact) তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি, আগস্ট ২০২৫ সালে নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রোটোকল (OPCAT) কার্যকর হয়েছে[4]। আশা করা হচ্ছে, বাংলাদেশ জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কনভেনশন (UNCAT)-এর আওতায় ব্যক্তিগত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্যাতনবিরোধী কমিটি (CAT)-এর এখতিয়ারও স্বীকৃতি দেবে।

এই ব্রিফিং পেপারটির উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের আলোকে বাংলাদেশে বিদ্যমান ক্ষতিপূরণ কাঠামো এবং নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণের শিকার ব্যক্তিদের জন্য পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে এর সীমাবদ্ধতাগুলো তুলে ধরা। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার উন্নত করা এবং ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণের অধিকার নিশ্চিত করতে প্রধান অংশীজনদের জন্য সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই ব্রিফিং পেপারটি BLAST (বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট) ও REDRESS-এর যৌথ উদ্যোগে প্রণীত হয়েছে, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্যাতনের জন্য জবাবদিহি, ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মূল বিষয়গুলো মোকাবিলায় একটি বৃহত্তর প্রকল্প অংশীদারিত্বের অংশ।

1 ওএইচসিএইচআর, তথ্য-উদ্ধার প্রতিবেদন: বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টের বিক্ষোভের সঙ্গে সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনসমূহ (ওএইচসিএইচআর তথ্য-উদ্ধার প্রতিবেদন), ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, পৃষ্ঠা i.

2 ওএইচসিএইচআর, তথ্য-উদ্ধার প্রতিবেদন: বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টের বিক্ষোভের সঙ্গে সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনসমূহ (ওএইচসিএইচআর তথ্য-উদ্ধার প্রতিবেদন), ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, পৃষ্ঠা i.

3 বিএলএএসটি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি: দণ্ডবিধির সংশোধনীতে গ্রেপ্তার সংক্রান্ত যে সুরক্ষাব্যবস্থা যুক্ত হয়েছে, তা স্বাগত জানাচ্ছে বিএলএএসটি, ১৩ আগস্ট ২০২৩।

4 বিএলএএসটি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি: ফৌজদারি কার্যবিধির সংশোধনীতে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে যে সুরক্ষা ব্যবস্থা যুক্ত হয়েছে, তার স্বাগত জানাচ্ছে বিএলএএসটি, ১৩ আগস্ট ২০২৫

পটভূমি

সহিংসতার পূর্ববর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যার মধ্যে জুলাই–আগস্ট ২০২৪-এর বিক্ষোভের অন্তর্নিহিত কারণসমূহ অন্তর্ভুক্ত

জুন ২০২৪ সালে বাংলাদেশের হাইকোর্ট সরকারি কর্মসংস্থানে ৩০ শতাংশ কোটা ব্যবস্থা পুনর্বহাল করেন, যার মাধ্যমে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রবীণদের সন্তানদের জন্য পদ সংরক্ষণ করা হয়[5]। এই নীতিটি 'মুক্তিযোদ্ধা'র সংজ্ঞা, কোটার শতকরা বণ্টন এবং সামগ্রিক ন্যায্যতা নিয়ে চলমান বিতর্ক ও মামলার জন্ম দেয়—যা উচ্চ বেকারত্ব এবং সরকারি চাকরির সামাজিক মর্যাদার প্রেক্ষাপটে আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

জুন ২০২৪ সালের হাইকোর্টের এই রায় ব্যাপক বিক্ষোভের সূচনা করে। শুরুতে বিক্ষোভগুলো কোটা ব্যবস্থাকেন্দ্রিক হলেও, দ্রুতই তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর বিরোধিতায় রূপ নেয়—বিশেষত বিক্ষোভকারীদের 'রাজাকার' হিসেবে আখ্যা দেওয়ার মতো মন্তব্যের পর, যা ঐতিহাসিকভাবে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে যুক্ত একটি শব্দ।[6] শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই আন্দোলনে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন ও নাগরিক সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী সমর্থন জানায়। বিক্ষোভকারীরা নির্বাচনের বৈধতা, রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন, ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদ এবং রাষ্ট্রের সব শাখার ওপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তারা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, গুম, নাগরিক পরিসর সংকুচিত হওয়া, এবং শ্রম ও ভোটাধিকার অবনতির মতো বিষয়গুলোও তুলে ধরেন—যার পটভূমিতে ছিল প্রায় ৪০ শতাংশ যুব বেকারত্ব, ১০ শতাংশ খাদ্য মূল্যস্ফীতি এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য[7]।

বিক্ষোভ চলাকালীন ও পরবর্তী সময়ে সংঘটিত লঙ্ঘনের বিবরণ

জুলাইয়ের প্রথম দিকের সপ্তাহগুলোতে বৃহৎ পরিসরের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের জবাবে সরকার ক্রমশ অতিরিক্ত মাত্রায় বলপ্রয়োগ করতে থাকে। ১৫ জুলাই তৎকালীন সরকার তার সমর্থকদের—বিশেষত ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ—বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে অংশ নিতে উৎসাহিত করে, যা বিক্ষোভ দমন করতে রাষ্ট্রের সহিংস প্রচেষ্টার অংশ ছিল[8]।

১৬ জুলাই পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে, যখন পুলিশের গুলিতে এক ছাত্রনেতা নিহত হন[9]। এরপর সরকার কুখ্যাত মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করে, যার মধ্যে ছিল বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (RAB)[10]। পরবর্তীতে সরকার সারা দেশে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে, দেশব্যাপী কারফিউ জারি করে, জাতীয় পর্যায়ে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় এবং পুলিশকে 'দেখামাত্র গুলি' করার নির্দেশ দেয়[11]।

নিরাপত্তা বাহিনীর এই সহিংস প্রতিক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে অপ্রয়োজনীয় ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড এবং প্রাণঘাতী ধাতব প্যালেটযুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে; ১৮ জুলাই[12] থেকে তারা খোলাখুলি রাইফেল, পিস্তল ও শটগান ব্যবহার শুরু করে। বিক্ষোভকারীদের অধিকাংশই নিরস্ত্র ছিলেন বা কেবল ইট ও

5 দ্য ডেইলি স্টার, সিভিল সার্ভিসে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের কোটা | সিভিল সার্ভিসে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য ৩০% কোটা বাতিল অবৈধ: হাইকোর্ট, ৫ জুন ২০২৪

6 দ্য ডেইলি স্টার, 'রাজাকার' ইস্যুতে দোলাচল: কে কী বললেন?, ১৫ জুলাই ২০২৪

7 এশিয়া প্যাসিফিক ফাউন্ডেশন অব কানাডা, ব্যাখ্যাকার: বাংলাদেশের প্রাণঘাতী প্রতিবাদের পেছনে কী রয়েছে?, ৩১ জুলাই ২০২৪

8 এশিয়া প্যাসিফিক ফাউন্ডেশন অব কানাডা, ব্যাখ্যাকার: বাংলাদেশের প্রাণঘাতী প্রতিবাদের পেছনে কী রয়েছে?, ৩১ জুলাই ২০২৪

9 দ্য ডেইলি স্টার, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সায়েদের পুলিশ গুলিতে মৃত্যু: পুলিশের এফআইআর পরিচিত তথ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, ২৭ জুলাই ২০২৪

10 দ্য ডেইলি স্টার, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সায়েদের পুলিশ গুলিতে মৃত্যু: পুলিশের এফআইআর পরিচিত তথ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, ২৭ জুলাই ২০২৪

11 দ্য গার্ডিয়ান, সারাদেশে কারফিউয়ের মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশকে 'দেখামাত্র গুলি' করার নির্দেশ, ২০ জুলাই ২০২৪

12 ওএইচসিএইচআর তথ্য-উদ্ধার প্রতিবেদন, প্যারা. ৪৩

লাঠি বহন করছিলেন[13]। জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর (OHCHR)-এর ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং প্রতিবেদনে বলা হয়, সর্বোচ্চ ১,৪০০ জন নিহত হতে পারেন—যাদের অধিকাংশই "বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রচলিত সামরিক রাইফেল ও প্রাণঘাতী ধাতব প্যালেটযুক্ত শটগানের গুলিতে" নিহত হয়েছেন—এবং আরও হাজার হাজার মানুষ আজীবন প্রভাব ফেলতে পারে এমন গুরুতর আঘাতের শিকার হয়েছেন[14]।

১১,৭০০-এর বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়, যাদের অনেককে আদালতে হাজির না করেই এবং আইনজীবীর সহায়তা ছাড়াই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আটক রাখা হয়[15]। আটকাবস্থায় নির্যাতন ও নিপীড়নের অভিযোগও পাওয়া যায়, পাশাপাশি নারী শিক্ষার্থী বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, নির্যাতন ও যৌন সহিংসতার ঘটনাও রিপোর্ট করা হয়[16]।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতন ও তার ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর, পুলিশের সদস্য ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক হামলায় আনুমানিক ১০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হন; একই সঙ্গে কিছু সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপরও হামলার ঘটনা ঘটে। বিক্ষোভকারীরা বাংলাদেশের ৬৩৯টি থানার মধ্যে ৪৫০টিতে ভাঙচুর বা অগ্নিসংযোগ করেন[17]।

বিক্ষোভ-পরবর্তী সময়ে মানবাধিকার রক্ষাকারীদের বিরুদ্ধে অপরাধীকরণ ও প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের নথিভুক্তকরণ

বিক্ষোভের পরবর্তী সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলির ব্যাপক নথিভুক্তকরণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর (OHCHR) কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ আগস্ট ২০২৪ সালে[18] প্রকাশিত হয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনটি ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালে প্রকাশিত হয় (OHCHR ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্ট)।

নাগরিক সমাজ—যার মধ্যে মানবাধিকার সংগঠন ও নাগরিক উদ্যোগসমূহ অন্তর্ভুক্ত—বিক্ষোভ চলাকালীন ও পরবর্তী সময়ে সংঘটিত লঙ্ঘন এবং বলপ্রয়োগের অনুমোদনে শেখ হাসিনার ভূমিকা নিয়েও বিস্তৃতভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে[19]। এসব নথিতে নিরাপত্তা বাহিনীর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের ব্যাপক ব্যবহার, ইচ্ছামতো গ্রেপ্তার, গুম, এবং আটকাবস্থায় নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণের ঘটনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে[20]। অধিকার-এর প্রতিবেদনে বিশেষভাবে মানবাধিকার রক্ষক ও কর্মীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে; সেখানে বলা হয়েছে যে বিক্ষোভের পরবর্তী সময়ে অনেকেই হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন[21]।

অন্তর্বর্তী সরকার এবং বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতিতে তার ভূমিকার সারসংক্ষেপ

২০২৪ সালের ৮ আগস্ট নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নেন। তিনি পরবর্তীতে ঘোষণা দেন যে ২০২৬ সালের[22] ফেব্রুয়ারিতে রমজানের আগেই জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। এরই মধ্যে, নির্বাচনী বৈধতার ম্যান্ডেট না থাকায় অন্তর্বর্তী সরকার ঐতিহাসিকভাবে শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীকে অসন্তুষ্ট না করার বিষয়ে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয়, এই সতর্কতাই নিরাপত্তা খাতে সুদূরপ্রসারী সংস্কার প্রবর্তনে অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের মনোযোগ অনিবার্যভাবে নির্বাচন প্রস্তুতির দিকে সরে যাবে, যার ফলে নাগরিক সমাজের পক্ষে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার পরিসর ও প্রভাব আরও সীমিত হয়ে পড়বে।

13 Ibid., প্যারা. ১০০.
14 Ibid., প্যারা. ১০০
15 Ibid., প্যারা. ১০০
16 Ibidd., প্যারা. ১৫৯
17 প্যারা. ১৫৯
18 ওএইচসিএইচআর, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রতিবাদ ও অস্থিরতার প্রাথমিক বিশ্লেষণ, ১৬ আগস্ট ২০২৪।
19 দেখুন, উদাহরণস্বরূপ: দ্য ডেইলি স্টার, শেখ হাসিনার 'শুট অর্ডার' জুলাই ২০২৪ ফাঁস হওয়া কল | 'সোজা গুলি করুন': হাসিনার নির্দেশ এবং প্রাণঘাতী পরিণতি, ২৪ জুলাই ২০২৫; আল–জাজিরা, 'গুলিতে মেরে ফেলো': ২০২৪ সালে বাংলাদেশি প্রতিবাদকারীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন শেখ হাসিনা | তদন্ত প্রতিবেদন, ২৪ জুলাই ২০২৫
20 দেখুন, উদাহরণস্বরূপ: অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশের কোটা সংস্কার আন্দোলনে কী ঘটছে?, ২৯ জুলাই ২০২৪; হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, বাংলাদেশ: নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিরস্ত্র শিক্ষার্থীরা টার্গেট, ২২ জুলাই ২০২৪; অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, অতিরিক্ত ভিডিও ও আলোকচিত্র বিশ্লেষণে নিশ্চিত হয়েছে যে পুলিশ অবৈধভাবে প্রাণঘাতী ও কম-প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করেছে প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে, জুলাই ২০২৪।
21 অধিকার, তিন মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদন: জুলাই – সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১৪ নভেম্বর ২০২৪, প্যারা. ৩৪
22 বিবিসি নিউজ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশ ছাড়ার এক বছর পূর্তিতে বাংলাদেশ নির্বাচন ঘোষণা করল, ৫ আগস্ট ২০২৫।

অতীতে বাংলাদেশের নির্বাচনগুলো প্রায়ই সহিংসতায় কলুষিত হয়েছে, এবং ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে একই ধরনের পরিস্থিতি পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে[23]। কিছু নাগরিক সমাজ সংগঠন নির্বাচন-পূর্ব সময়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং নাগরিক পরিসরের ওপর চলমান হুমকির বিষয়েও উদ্বেগ জানিয়েছে[24]।

23 দেখুন, উদাহরণস্বরূপ: ফ্রিডম হাউস, ফ্রিডম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ২০২৫: বাংলাদেশ দেশ প্রতিবেদন, ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

24 আর্টিকেল ১৯ ও অন্যান্য সংস্থা, বাংলাদেশ: ডিজিটাল যুগে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও নির্বাচনী সুষ্ঠুতা রক্ষা, মানবাধিকার পরিষদের উদ্দেশ্যে যৌথ বিবৃতি, জুন ২০২৫

পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা

নির্যাতন সংক্রান্ত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক আইনগত বাধ্যবাধকতা

মানবাধিকার সুরক্ষা এবং নির্যাতন ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাংলাদেশ একাধিক আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। এসব অঙ্গীকার গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসমর্থনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক তদারকি ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতির ক্ষেত্রে এখনও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি রয়ে গেছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অন্যান্যগুলোর পাশাপাশি নিম্নোক্ত চুক্তিসমূহ অনুসমর্থন করেছে—

ক) নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কনভেনশন (UNCAT) (১৯৯৮ সালে অনুসমর্থিত)। আগস্ট ২০২৫ সালে বাংলাদেশ এই কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রোটোকল (OPCAT) অনুসমর্থন করে, যার উদ্দেশ্য হলো আটকস্থলসমূহে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
খ) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (ICCPR) (২০০০ সালে অনুসমর্থিত)।
গ) শিশু অধিকার সনদ (CRC) (১৯৯০ সালে অনুসমর্থিত)।
ঘ) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) (১৯৮৪ সালে অনুসমর্থিত)।
ঙ) জোরপূর্বক গুমের বিরুদ্ধে সকল ব্যক্তির সুরক্ষা সংক্রান্ত কনভেনশন (CED) (আগস্ট ২০২৪ সালে অনুসমর্থিত)।

দুঃখজনকভাবে, বাংলাদেশ এখনও এই পাঁচটি চুক্তিতে নির্ধারিত আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের অভিযোগ সংক্রান্ত ব্যক্তিগত অভিযোগ পর্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কোনো জাতিসংঘ চুক্তি সংস্থার এখতিয়ার স্বীকৃতি দেয়নি। এই এখতিয়ার স্বীকৃতি দিলে তা শুধু রাষ্ট্রীয় জবাবদিহি ও ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগ জোরদারই করবে না, বরং জাতীয় আইন ও চর্চাকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উদাহরণস্বরূপ, OPCAT-এর সাম্প্রতিক অনুসমর্থন একটি স্বাধীন জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা (National Preventive Mechanism—NPM) গঠনের পথ সুগম করেছে, যা আটকস্থলসমূহ পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রস্তাব প্রদান এবং নির্যাতন প্রতিরোধে জাতিসংঘের উপকমিটি (SPT)-এর সহায়তা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞান থেকে বাংলাদেশকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেবে[25]।

নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণের জন্য ক্ষতিপূরণ (Reparation) সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

এসব আন্তর্জাতিক চুক্তি বাংলাদেশের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের—বিশেষত নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণের ভুক্তভোগীদের—জন্য প্রতিকার (redress) নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। নির্যাতনবিরোধী জাতিসংঘ কনভেনশন (UNCAT)-এর ১৪ অনুচ্ছেদে প্রত্যেক রাষ্ট্রপক্ষকে তার আইনগত ব্যবস্থায় এমন নিশ্চয়তা দিতে বলা হয়েছে, যাতে "নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি প্রতিকার লাভ করতে পারেন এবং ন্যায্য ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কার্যকর অধিকার ভোগ করেন।" একইভাবে, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (ICCPR)-এর ২(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক রাষ্ট্রপক্ষকে "যার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে"—যার মধ্যে রয়েছে তদন্ত করার দায়িত্ব এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের বাধ্যবাধকতা[26]।

25 রিড্রেস, রেড্রেস ও অংশীদারদের বাংলাদেশের নির্যাতনবিরোধী সুরক্ষা জোরদার করার পদক্ষেপকে স্বাগত, ২৯ জুলাই ২০২৫

26 দেখুন এছাড়াও: জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি (এইচআরসি), সাধারণ মন্তব্য নং ৩১, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, ২৬ মে ২০০৪, প্যারা. ১৬; এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের গুরুতর লঙ্ঘন এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের প্রতিকার ও পুনরparation অধিকার সম্পর্কিত মৌলিক নীতি ও নির্দেশিকা (জাতিসংঘের মৌলিক নীতিমালা), A/RES/60/147, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৫। এইচআরসি আরও বলেছে যে রাষ্ট্রগুলোকে শুধু আইনে প্রতিকার প্রদান করলেই হবে না, বরং এই প্রতিকার যেন বাস্তবে কার্যকর হয় তা-ও নিশ্চিত করতে হবে (Sahadath বনাম ত্রিনিদাদ ও টোবাগো (যোগাযোগ নং ৬৮৪/১৯৯৬), প্যারা. ৯)।

ভুক্তভোগীদের অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দ্বৈত বাধ্যবাধকতা রয়েছে: একদিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের একটি মৌলিক বাধ্যবাধকতা, অন্যদিকে কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করার একটি প্রক্রিয়াগত বাধ্যবাধকতা। নির্যাতনবিরোধী কমিটি (CAT)-এর সাধারণ মন্তব্য নং ৩ এবং জাতিসংঘের মৌলিক নীতিমালায় ক্ষতিপূরণের পাঁচটি রূপ নির্ধারণ করা হয়েছে: পুনঃস্থাপন, ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন, সন্তুষ্টি এবং পুনরাবৃত্তি রোধের নিশ্চয়তা। এসব উপাদানকে পরস্পরের বিকল্প হিসেবে নয়, বরং পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা উচিত[27]। নিচে প্রতিটি উপাদান বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো[28]।

পুনঃস্থাপন - এর অর্থ হলো ভুক্তভোগীকে সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনা, যেখানে তিনি লঙ্ঘন সংঘটিত হওয়ার আগে ছিলেন। অপরাধের প্রকৃতির কারণে নির্যাতনের ক্ষেত্রে পুনঃস্থাপন অনেক সময় সম্ভব বা উপযুক্ত নাও হতে পারে; তবে নির্যাতনের সঙ্গে সংঘটিত অন্যান্য লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হতে পারে। যেকোনো অবস্থায়, লঙ্ঘনের পেছনে থাকা কাঠামোগত কারণগুলো মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপের সঙ্গে এটি যুক্ত থাকা উচিত। এর মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা বা সুনাম পুনরুদ্ধার, কর্মসংস্থান বা সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ক্ষতিপূরণ - ক্ষতিপূরণ আর্থিক প্রকৃতির এবং এতে আর্থিক ও অ-আর্থিক উভয় ধরনের ক্ষতির প্রতিফলন থাকা উচিত।[29] তবে শুধু ক্ষতিপূরণই নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের জন্য যথেষ্ট প্রতিকার নয়; এটি অবশ্যই ক্ষতিপূরণের অন্যান্য রূপের সঙ্গে সমন্বিতভাবে প্রদান করতে হবে।

পুনর্বাসন - এই ক্ষতিপূরণ রূপটি সমন্বিত হওয়া উচিত এবং এর মধ্যে মানসিক ও শারীরিক চিকিৎসা, পাশাপাশি আইনগত ও সামাজিক সেবাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর লক্ষ্য হলো ভুক্তভোগীকে সমাজে পুনঃএকীভূত হতে সহায়তা করা এবং তার মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা। পুনর্বাসন একটি দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা, যা এককালীন কোনো সেবা প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এটি ভুক্তভোগীর সম্মতি সাপেক্ষে প্রদান করতে হবে এবং তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন, মামলার পারিপার্শ্বিকতা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া উচিত।[30]

সন্তুষ্টি - এর মধ্যে রয়েছে লঙ্ঘনের অবসান ঘটানো, সংঘটিত লঙ্ঘনের বিষয়ে কার্যকর তদন্ত পরিচালনা এবং দায়ীদের শাস্তির আওতায় আনা, পাশাপাশি সত্য উদঘাটন (যেমন, গুম হওয়া ব্যক্তির অবস্থান নির্ধারণ বা নিহতদের মরদেহ অনুসন্ধান)। সত্য অনুসন্ধান ও প্রকাশের প্রক্রিয়ায় ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা যাবে না। সন্তুষ্টির মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণও অন্তর্ভুক্ত—যেমন প্রকাশ্য ক্ষমা প্রার্থনা, স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ এবং অন্যান্য সমষ্টিগত ও স্মরণমূলক উদ্যোগ, যা সংঘটিত লঙ্ঘনের স্বীকৃতি প্রদান করে।

পুনরাবৃত্তি রোধের নিশ্চয়তা - এগুলো ভবিষ্যতে নির্যাতন ও অন্যান্য লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি ঠেকানোর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ। এর মধ্যে আইন সংস্কার, নীতিমালা ও চর্চার পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, UNCAT-এর বিধানগুলোকে দেশীয় আইনে কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করা এই ধরনের ক্ষতিপূরণের একটি স্পষ্ট উদাহরণ। পাশাপাশি, পুলিশ, আটক কেন্দ্রের কর্মকর্তা, সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগ, চিকিৎসা কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নির্যাতনবিরোধী মানদণ্ডে প্রশিক্ষণ প্রদানও এর অংশ। এটি এমন সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তনের সঙ্গেও যুক্ত, যা নির্যাতনের মতো কর্মকাণ্ডকে সহনীয় করে তোলে এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতি বজায় রাখে। এর আওতায় নির্যাতনের ওপর পরম নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে যেকোনো প্রক্রিয়াগত বা মৌলিক প্রতিবন্ধকতা (যেমন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি) অপসারণ করাও অন্তর্ভুক্ত।

27 নির্যাতনবিরোধী কমিটি (CAT), সাধারণ মন্তব্য নং ৩ (২০১২): রাষ্ট্র পক্ষসমূহের দ্বারা অনুচ্ছেদ ১৪ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত (সাধারণ মন্তব্য নং ৩), CAT/C/GC/3, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২

28 [১] অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দেখুন: রেড্রেস, প্র্যাকটিস নোট ১০: নির্যাতনের শিকারদের জন্য পুনরparation, ২০২৩

29 অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দেখুন: রেড্রেস, প্র্যাকটিস নোট ১২: নির্যাতনের শিকারদের জন্য ক্ষতিপূরণ, অক্টোবর ২০২৪

30 জাতিসংঘের মৌলিক নীতিমালা, প্যারা. ১২.

কার্যকর প্রতিকার

কার্যকর প্রতিকারের অধিকার মানে হলো নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের জন্য ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার এবং ন্যায্য, নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন বিচারিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।[31] এর জন্য দেশীয় আইনে নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা এবং ভুক্তভোগীদের জন্য প্রতিকার চাওয়া ও পাওয়ার স্পষ্ট পথ থাকা আবশ্যক।[32] একই সঙ্গে রাষ্ট্রের ওপর বাধ্যবাধকতা রয়েছে নির্যাতনের দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা—অভিযোগ গঠন ও বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, অথবা এমন বিচারব্যবস্থায় প্রত্যর্পণের মাধ্যমে, যেখানে তাদের বিচার করা সম্ভব।

এই অধিকারটি UNCAT-এর অধীনে রাষ্ট্রের তদন্তমূলক বাধ্যবাধকতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ইস্তাম্বুল প্রোটোকল নির্যাতনের কার্যকর তদন্ত ও নথিভুক্তকরণের মানদণ্ড ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে।[33]

এছাড়া, প্রতিকার পাওয়ার প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাসমূহ নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের কাছে পরিচিত ও সহজলভ্য হতে হবে।[34] এর মধ্যে যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং এমন একটি ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অন্তর্ভুক্ত, যা আর্থিক অপ্রাপ্যতা বা অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার কারণে ভুক্তভোগীদের আবেদন করতে নিরুৎসাহিত করবে না।[35] এসব ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া অবশ্যই বৈষম্যহীন এবং লিঙ্গ-সংবেদনশীল হতে হবে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ব্যবস্থাসমূহ ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশকে নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের জন্য কার্যকর ও পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণ কাঠামো নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে আসছে।[36] সর্বশেষ, জুলাই মাসের বিক্ষোভ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত ২০২৫ সালের OHCHR ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্টে ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

31 জাতিসংঘের মৌলিক নীতিমালা, প্যারা. ৬২

32 জাতিসংঘের মৌলিক নীতিমালা, প্যারা. ৬২.

33 ওএইচসিএইচআর, নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির কার্যকর তদন্ত ও নথিবদ্ধকরণ বিষয়ক ম্যানুয়াল ('ইস্তাম্বুল প্রোটোকল'), ২০২২

34 সাধারণ মন্তব্য নং ৩, প্যারা. ২৩, ২৫.

35 Ibid., প্যারা. ৩০

36 উদাহরণস্বরূপ দেখুন: সিএটি, বাংলাদেশের প্রাথমিক প্রতিবেদনের ওপর উপসংহারমূলক পর্যবেক্ষণ, CAT/C/BGD/CO/1, ২৬ আগস্ট ২০১৯, প্যারা. ৪৪–৪৫; ওএইচসিএইচআর, জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞরা মানবাধিকার রক্ষক এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের স্বজনদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ বন্ধ করার আহ্বান জানালেন, ১৪ মার্চ ২০২২; ওএইচসিএইচআর, সার্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা – বাংলাদেশ, চতুর্থ চক্র, ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিবেদন, ১৩ নভেম্বর ২০২৩।

ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিদ্যমান পথসমূহ

বিচারিক ব্যবস্থা

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আইনগত কাঠামোতে নির্যাতনের ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ চাওয়ার কয়েকটি বিচারিক পথ বিদ্যমান। তবে বাস্তবে এসব ব্যবস্থা কার্যকর নয় এবং এতে গুরুতর প্রক্রিয়াগত ও কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩

এই আইনটি নির্যাতন মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রধান আইনগত কাঠামো, যা নির্যাতনবিরোধী জাতিসংঘ কনভেনশন (UNCAT)-এর অধীনে বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা পূরণের লক্ষ্যে প্রণীত।[37] যদিও আইনটি নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং সীমিত পরিসরে ক্ষতিপূরণের সুযোগ রাখে, বাস্তবে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা অত্যন্ত সীমিত।[38]

এই আইনের অধীনে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি বা তার পরিবার দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়রা আদালতে মামলা করতে পারেন। দোষী সাব্যস্ত হলে আদালত কারাদণ্ড দিতে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন। তবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্যাতনবিরোধী কমিটি (CAT) কর্তৃক "খুবই কম"[39] বলে সমালোচিত হয়েছে। আইনে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির জন্য সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা (প্রায় ২০০ মার্কিন ডলার[40]) এবং নির্যাতনের ফলে মৃত্যু হলে[41] ২,০০,০০০ টাকা (প্রায় ১,৬০০ মার্কিন ডলার) ক্ষতিপূরণের বিধান রয়েছে। গড়ে বার্ষিক পারিবারিক আয় যেখানে প্রায় ৩,৮৯,০০০ টাকা[42], সেখানে এই অঙ্ক নিজেই ভুক্তভোগীদের অভিযোগ জানাতে নিরুৎসাহিত করে।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের সমন্বিত চরিত্র বিবেচনায় নিলে এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে আইনটি কেবল ক্ষতিপূরণের কথাই বলে; পুনর্বাসন, পুনঃস্থাপন, সন্তুষ্টি বা পুনরাবৃত্তি রোধের নিশ্চয়তার মতো অন্যান্য কোনো ক্ষতিপূরণ রূপ এতে নেই[43]। তদুপরি, ক্ষতিপূরণ কেবল দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরই প্রদানযোগ্য—অন্তর্বর্তী সহায়তার কোনো বিধান নেই—ফলে ভুক্তভোগীরা দীর্ঘ বিলম্বের শিকার হন। আরও একটি সমস্যা হলো, ক্ষতিপূরণ সরাসরি অপরাধীর কাছ থেকেই আদায়যোগ্য; অপরাধীর পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকলে ভুক্তভোগী বা তার পরিবার কার্যত কোনো ক্ষতিপূরণই পান না।

আইনটি প্রণীত হওয়ার এক দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও মাত্র একটি মামলায় দণ্ডাদেশের নজির পাওয়া যায় এবং এখনো কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি—যা বাস্তবে আইনটির অকার্যকারিতা স্পষ্ট করে। মামলাটি ২০১৪ সালে পুলিশের নির্যাতনে দুই ভাই—ইশতিয়াক হোসেন জনি ও ইমতিয়াজ হোসেন রকি—নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঘটনা সংক্রান্ত, যেখানে জনির মৃত্যু হয়। আদালত দায়ী পুলিশ সদস্যদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিলেও, চলমান আপিলের কারণে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত ভুক্তভোগী পরিবার কোনো অর্থ পায়নি[44]।

37 বাংলাদেশ সরকার, নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিষেধাজ্ঞা) আইন, ২০১৩, ২০১৩

38 ওএমসিটি, বাংলাদেশ: নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণের পরম নিষেধাজ্ঞা রক্ষা, দায়মুক্তির অবসান এবং ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা প্রদানে সরকারের বাধ্যবাধকতা পালন করতে হবে, ২৬ জুন ২০২৪। এছাড়াও দেখুন: ব্লাস্ট, নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩-এর পর্যালোচনা, ডিসেম্বর ২০১৫।

39 CAT, বাংলাদেশের প্রাথমিক প্রতিবেদনের উপর উপসংহারমূলক পর্যবেক্ষণ, CAT/C/BGD/CO/1, ২৬ আগস্ট ২০১৯, প্যারা ৪৪।

40 জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী মুদ্রা রূপান্তরসমূহ.

41 ধারা ১৫(২)

42 বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, গৃহস্থালি আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২, ১২ এপ্রিল ২০২৩, পৃষ্ঠা ১১

43 বিএলএএসটি, নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (প্রতিরোধ) আইন ২০১৩ এর পর্যালোচনা, ডিসেম্বর ২০১৫, প্যারা ৪.৭; নির্যাতনবিরোধী কমিটি, বাংলাদেশের প্রাথমিক প্রতিবেদনের উপর উপসংহারমূলক পর্যবেক্ষণ, CAT/C/BGD/CO/1, ২৬ আগস্ট ২০১৯, প্যারা ৪৪।

44 অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ: নির্যাতনের দায়মুক্তি অবসান করুন এবং ভুক্তভোগীদের প্রতিকার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করুন, ২৬ জুন ২০২৪।

অন্যান্য বিচারিক প্রতিকার

সাধারণ ফৌজদারি কার্যক্রম - ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৫৪৫(১)(খ) ধারার অধীনে আদালত অপরাধীর ওপর আরোপিত জরিমানা ভুক্তভোগীকে (নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিসহ) ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন—তবে কেবল তখনই, যখন আদালতের মতে দেওয়ানি আদালতে "উল্লেখযোগ্য ক্ষতিপূরণ আদায়যোগ্য"[45]। এই বিধানটি ঐচ্ছিক এবং খুব কমই প্রয়োগ করা হয়। ২০০৭ সালে অপরাধভুক্তভোগী ক্ষতিপূরণ আইন প্রস্তাব করতে গিয়ে বাংলাদেশ আইন কমিশন মন্তব্য করেছিল যে, ৫৪৫ ধারা "অপরাধের শিকারদের কোনো সহায়তা করে না"; বরং ভুক্তভোগীদের ব্যয়বহুল দেওয়ানি প্রক্রিয়ার মধ্যে ঠেলে দেয় এবং এমন অপরাধীর ওপর নির্ভর করে, যার পর্যাপ্ত সম্পদ থাকতে হবে।[46]

সংবিধানিক রিট আবেদন - নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টে রিট আবেদন করে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার চাইতে পারেন।[47] আদালত ক্ষতিপূরণসহ অন্যান্য প্রতিকার দিতে পারেন এবং এর জন্য পূর্ববর্তী কোনো দণ্ডাদেশের প্রয়োজন নেই।[48] তাত্ত্বিকভাবে এই পথটি আশাব্যঞ্জক, বিশেষত 'প্রমাণের ভার স্থানান্তর'-এর সম্ভাবনার কারণে—যেখানে ভুক্তভোগীর পরিবর্তে অভিযুক্তকে প্রমাণ করতে হয় যে তিনি নির্যাতনের জন্য দায়ী নন। গবেষকরাও লক্ষ্য করেছেন যে আদালত "ক্রমশ বড় অঙ্কের জনস্বার্থমূলক ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং আরও বিস্তৃত পরিসরের লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগে আগ্রহী হয়ে উঠছে।"[49]

তবে CCB Foundation - বনাম বাংলাদেশ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মত দেন যে, দেওয়ানি প্রতিকারের অস্তিত্ব জনস্বার্থমূলক ক্ষতিপূরণ এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে—যা ইঙ্গিত দেয় যে আদালত এই পথকে পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে একটি অস্থায়ী প্রতিকার হিসেবে দেখছে।[50] পাশাপাশি বাস্তব সমস্যাও রয়ে গেছে—যেমন প্রমাণসংক্রান্ত জটিলতা (ইস্তাম্বুল প্রোটোকলসম্মত মেডিকো-লিগ্যাল প্রতিবেদন পাওয়া কঠিন) এবং ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা, কারণ রিট কেবল ঢাকার হাইকোর্ট বিভাগেই দায়ের করা যায় (যদিও কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনায় জেলা পর্যায়ের আদালতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নজির রয়েছে)।[51]

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC) - কমিশন অভিযোগ গ্রহণ ও সরকারের কাছে প্রতিবেদন চাইতে পারে, তবে এর প্রয়োগক্ষমতা নেই।[52] পুলিশবিরোধী অভিযোগ সরাসরি তদন্ত করার ক্ষমতাও তাদের নেই এবং রাজনৈতিক নিয়োগ ও সরকারি কর্মকর্তা প্রেষণে আসার কারণে কমিশন কাঠামোগতভাবে দুর্বল।[53] ২০১৫ সালে প্যারিস নীতিমালার সঙ্গে অসামঞ্জস্যতার কারণে জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈশ্বিক জোট NHRC-কে 'বি' শ্রেণিতে নামিয়ে আনে।[54]

দেওয়ানি ক্ষতিপূরণ মামলা - ভুক্তভোগীরা টর্ট আইনের আওতায় 'ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশ' (assault বা battery) সংক্রান্ত মামলায় ক্ষতিপূরণ চাইতে পারেন। তবে এসব মামলায় এক বছরের কঠোর সময়সীমা রয়েছে।[55] পাশাপাশি মামলার দাবিকৃত অর্থের ২.৫ শতাংশ (সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা[56]) জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা এবং টর্ট আইনে বিচার বিভাগের সীমিত অভিজ্ঞতার কারণে বিলম্ব ঘটে।[57]

45 অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ: নির্যাতনের দায়মুক্তি অবসান করুন এবং ভুক্তভোগীদের প্রতিকার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করুন, ২৬ জুন ২০২৪।

46 বাংলাদেশ আইন কমিশন, অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তাবিত আইনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা ৭

47 বাংলাদেশ আইন কমিশন, অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তাবিত আইনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা ৭

48 বোনাভেরো ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটস, মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দেওয়ানি দায়, অক্টোবর ২০২২, প্যারা ৩৫।

49 তাকবীর হুদা, সংবিধানিক প্রতিকার অনুসন্ধানে মৌলিক অধিকার: বাংলাদেশে জনস্বার্থে দেওয়ানি ক্ষতিপূরণের উদ্ভব, জুন ২০২১, পৃষ্ঠা ৪৪

50 বোনাভেরো ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটস, পূর্বোক্ত, প্যারা ৩৬।

51 পূর্বোক্ত, প্যারা ৩৮। এছাড়াও দেখুন: তাকবীর হুদা, সংবিধানিক প্রতিকার অনুসন্ধানে মৌলিক অধিকার: বাংলাদেশে জনস্বার্থে দেওয়ানি ক্ষতিপূরণের উদ্ভব, জুন ২০২১।

52 মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তর্জাতিক সমন্বয় কমিটি, সাব-কমিটি অন অ্যাক্রেডিটেশন (এসসিএ)-এর অধিবেশনের প্রতিবেদন ও সুপারিশসমূহ, মার্চ ২০১৫, পৃষ্ঠা ৬২।

53 এনএইচআরসি আইনের ধারা ১৮ অনুযায়ী, 'শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনী'-সংক্রান্ত অভিযোগ শুধুমাত্র সরকার নিজেই তদন্ত করতে পারে এবং এ বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা যেতে পারে। ধারা ২(গ)-তে শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ১৫২(১)-এর প্রতি নির্দেশ করে। ওই সংবিধানিক ধারায় 'শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনী' বলতে সামরিক বাহিনী বা পুলিশ বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে।

54 মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তর্জাতিক সমন্বয় কমিটি, মার্চ ২০১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬২–৬৫। এছাড়াও দেখুন: অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ: সংস্কার কার্যসূচির মধ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়, যেখানে ২০২৪ সালের জুলাই মাসের বিক্ষোভ চলাকালে এনএইচআরসির নিষ্ক্রিয়তার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

55 বোনাভেরো ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটস, পূর্বোক্ত, প্যারা ৬৫।

56 জেনারেল কমেন্ট নং ৩, প্যারা ২৯, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, "নাগরিক মামলা এমন কোনো আর্থিক বোঝা আরোপ করা উচিত নয় যা ভুক্তভোগীদের প্রতিকার চাইতে বাধা দেয় বা নিরুৎসাহিত করে।

57 বোনাভেরো ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটস, পূর্বোক্ত, প্যারা ৬৬।.

এসব বিচারিক প্রতিকারের কোনোটিই নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের জন্য সমন্বিত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করে না। সর্বোচ্চ যা পাওয়া যায়, তা কেবল আর্থিক ক্ষতিপূরণ—উপরে আলোচিত অন্যান্য ক্ষতিপূরণ রূপ উপেক্ষিতই থেকে যায়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

২০২৪ সালের সহিংসতা মোকাবিলায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (ICT) পুনর্গঠন করা দেশটির অন্তর্বর্তী ন্যায়বিচার প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নির্দেশ করে।[58] ট্রাইব্যুনালটি মূলত ১৯৭৩ সালে স্বাধীনতার পর পাকিস্তানি বাহিনীর আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারের জন্য গঠিত হলেও তখন কোনো বিচার হয়নি। ২০০৯ সালে এটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন সহযোগিতার অভিযোগে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিচার শুরু করে—যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ন্যায্য বিচারবঞ্চনার অভিযোগে ব্যাপক সমালোচিত হয়। সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালে জুলাই–আগস্ট ২০২৪[59] হত্যাকাণ্ড সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অপরাধের অভিযোগে নতুন কৌঁসুলি নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৭ নভেম্বর ২০২৫ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। বিচারটি অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ন্যায্য বিচার লঙ্ঘনের একাধিক অভিযোগ ওঠে।[60]

২০১২ সাল থেকে ট্রাইব্যুনালের অপরাধের গুরুতরতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে[61] এবং নভেম্বর ২০২৪ থেকে এটি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধের ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষমতাও পায়।[62] এই ক্ষতিপূরণ অপরাধীর বর্তমান বা ভবিষ্যৎ সম্পদ থেকে আদায়যোগ্য।[63] তবে সাধারণ ফৌজদারি ব্যবস্থার মতো এখানেও একই সমস্যা রয়ে গেছে—অপরাধীর পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকলে ভুক্তভোগী বা নিহতদের পরিবার কিছুই পেতে নাও পারে। উচ্চপর্যায়ের অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে সম্পদ অনুসন্ধান আরও জটিল। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী, অপরাধী ক্ষতিপূরণ দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হলেও ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার প্রধান দায় রাষ্ট্রেরই।[64]

এই ইতিবাচক পরিবর্তন সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনালের ক্ষতিপূরণ কাঠামো এখনো অপরিণত ও সম্পূর্ণভাবে বিবেচনাধীন। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ বা বাস্তবায়নের জন্য কোনো সুস্পষ্ট আইনগত ভিত্তি নেই এবং পুনঃস্থাপন, পুনর্বাসন, সন্তুষ্টি বা পুনরাবৃত্তি রোধের নিশ্চয়তার মতো অ-আর্থিক ক্ষতিপূরণের কোনো বিধানও নেই।

পাশাপাশি ট্রাইব্যুনালের বৈধতা ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য নিয়ে উদ্বেগ অব্যাহত রয়েছে। OHCHR ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্ট ট্রাইব্যুনালের মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষমতার বিরোধিতা করেছে এবং "চলমান যথাযথ প্রক্রিয়া ও ন্যায্য বিচার সংক্রান্ত উদ্বেগ" দূর করার আহ্বান জানিয়েছে।[65]

প্রশাসনিক প্রক্রিয়া

তাত্ত্বিকভাবে এসব প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সংকট-পরবর্তী সময়ে তুলনামূলকভাবে দ্রুত ও সহজলভ্য সহায়তা দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে। তবে বাস্তবে এগুলো বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত এবং স্বচ্ছতার ঘাটতিতে ভুগছে। উল্লেখযোগ্য যে, এসব প্রশাসনিক উদ্যোগ মূলত ঘটনাবলির শিকারদের জন্য জরুরি সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়েছিল; আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী উপরে আলোচিত সব ধরনের ক্ষতিপূরণ (reparation) নিশ্চিত করতে সক্ষম কোনো পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণ কর্মসূচি হিসেবে এগুলো পরিকল্পিত ছিল না।

58 জাস্টিস ইনফো, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দ্বিতীয় জীবন, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

59 ডেভিড বারহাম ফর জাস্টিসইনফো, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দ্বিতীয় জীবন, ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

60 ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), স্বৈরশাসনের পতনের এক বছর পর: প্রত্যাশা ও বাস্তবতা – নির্বাহী সারসংক্ষেপ (টিআইবি নির্বাহী সারসংক্ষেপ), ২০২৫; আল-জাজিরা, বাংলাদেশ ট্রাইব্যুনাল প্রতিবাদকারীদের মৃত্যুর ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে অভিযুক্ত করেছে, ১০ জুলাই ২০২৫; বিবিসি, বাংলাদেশের সাবেক নেত্রী বিবিসিকে বলেছেন তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী নন, ১৩ নভেম্বর ২০২৫; দ্য গার্ডিয়ান, বাংলাদেশের অপসারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, ১৭ নভেম্বর ২০২৫।

61 আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কার্যবিধি, ২০১০, বিধি ৪৬(৩)।

62 আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩, ধারা ২০এ।

63 দ্য ডেইলি স্টার, আন্তর্জাতিক অপরাধের শিকারদের ক্ষতিপূরণ, ৪ এপ্রিল ২০২৫।

64 জাতিসংঘের মৌলিক নীতিমালা XI. ১৬।

65 ওএইচসিএইচআর ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্ট, প্যারা ৩৪৭–৩৪৯।

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন

জুলাই ২০২৪-এর সহিংসতার পরবর্তী মাসগুলোতে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও নিহতদের পরিবারকে তাৎক্ষণিক সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে একাধিক প্রশাসনিক স্কিম চালু করে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন, যা সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ চালু করা হয়—বিক্ষোভে নিহত, আহত বা অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য।[66]

ফাউন্ডেশনটি প্রাথমিকভাবে সরকারের কাছ থেকে ১০০ কোটি টাকা (প্রায় ৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বরাদ্দ পায়, যাতে নিহতদের পরিবারের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান করা যায়।[67] প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিক্ষোভের কয়েক মাসের মধ্যেই অর্থ বিতরণ শুরু হয়—যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নজিরবিহীন দ্রুততা।[68] ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ ফাউন্ডেশন জানায়, তারা প্রায় ৪৮ কোটি টাকা (প্রায় ৩.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিতরণ করেছে—প্রায় ২,২০০টি নিহত পরিবার ও আহত ব্যক্তির মধ্যে।[69] জানুয়ারি ২০২৫-এ অন্তর্বর্তী সরকার আরও ৬৩৮ কোটি টাকা (প্রায় ৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) আহত ব্যক্তি ও নিহতদের পরিবারকে সহায়তা হিসেবে বিতরণের ঘোষণা দেয়।[70] আগস্ট ২০২৫ নাগাদ ধারণা করা হয়, ফাউন্ডেশনটি প্রায় ১১১ কোটি টাকা (৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি) বিতরণ করেছে—প্রায় ৭,৫০০ জন নিহত ও আহত ব্যক্তির স্বজনদের সহায়তায়।[71]

তবে কিছু ভুক্তভোগী অভিযোগ করেছেন যে, প্রাথমিকভাবে আহতদের জন্য ১ লাখ টাকা এবং নিহতদের পরিবারের জন্য ৫ লাখ টাকা সহায়তা অপর্যাপ্ত; পাশাপাশি আবেদন প্রক্রিয়ায় বুরক্রাটিক জটিলতা অর্থপ্রাপ্তিকে বাধাগ্রস্ত করছে।[72] অর্থ বিতরণে বিলম্বের কারণে জনঅসন্তোষ ও প্রতিবাদ দেখা দিয়েছে—এর মধ্যে রয়েছে নভেম্বর ২০২৪-এ[73] ঢাকার একটি হাসপাতালে ১৩ ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি এবং জুলাই ২০২৫-এ ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনা।[74] ফাউন্ডেশনের কর্মীরাও জানিয়েছেন, অর্থের ঘাটতি এই স্কিমের দীর্ঘমেয়াদি টেকসইতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।[75]

কাঠামোগতভাবে এই স্কিমটি নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের সমালোচনার মুখে পড়েছে—কারণ এতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে, কোনো আইনি ভিত্তি নেই এবং প্রদত্ত অর্থের কোনো স্পষ্ট আইনি শ্রেণিবিন্যাসও করা হয়নি। তাছাড়া এটি কেবল জুলাই ২০২৪-এর বিক্ষোভের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং নির্যাতনের সব ঘটনা এতে অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে—যেমন ইচ্ছামতো আটক, মানসিক নির্যাতন বা কম দৃশ্যমান নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা। এই নির্বাচনী স্বীকৃতি সমান আচরণের নীতিকে ক্ষুণ্ন করে এবং দ্বিতীয়বারের মতো ভুক্তভোগীকরণের ঝুঁকি তৈরি করে।

অন্তর্বর্তী সরকারের ত্রাণ তহবিল

অন্তর্বর্তী সরকারের ত্রাণ তহবিলটি জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করছে। এটি জুলাই বিক্ষোভে আহত ও নিহতদের পরিবারের জন্য রাষ্ট্রনির্ভর স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা এবং ক্ষতিপূরণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত।

আগস্ট ২০২৪-এ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম দিককার সিদ্ধান্তগুলোর একটি ছিল—বিক্ষোভে আহতদের চিকিৎসা ব্যয় বহনের ঘোষণা। পরে সরকার জানায়, প্রতিটি নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ৩০ লাখ টাকা (প্রায় ২৪,৫০০ মার্কিন ডলার) ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, যা জুলাই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে।[76] এর পাশাপাশি, জুলাই ২০২৫-এ নিহতদের পরিবারের জন্য মাসিক ২০ হাজার টাকা ভাতা এবং সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।[77]

---

66 দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, জুলাই ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪: সিএ'র কল্যাণ তহবিল থেকে ১০০ কোটি টাকা অনুদানে শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন উদ্বোধন

67 দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, জুলাই সিএ'র তহবিল থেকে ১ বিলিয়ন টাকার সহায়তায় শহীদ ফাউন্ডেশন যাত্রা শুরু করেছে, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

68 বিএসএস নিউজ, জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন আহত ব্যক্তিদের মধ্যে অনুদান বিতরণ করেছে, ১৩ অক্টোবর ২০২৪

69 দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, প্রায় ছয় মাস পরও আহত বিক্ষোভকারীরা অনিশ্চয়তার মুখে, ৪ জানুয়ারি ২০২৫

70 ওএইচসিএইচআর সত্য-অনুসন্ধান প্রতিবেদন, প্যারা ২৬৩।

71 টিআইবি নির্বাহী সারসংক্ষেপ, পৃষ্ঠা ১৪।

72 দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই উত্থান-সংক্রান্ত ভিকটিম ক্ষতিপূরণ বাংলাদেশ | আহত আন্দোলনকারীরা: ক্ষতিপূরণ জটিল প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় আটকে আছে, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

73 প্রথম আলো, আহতদের চিকিৎসা: চলমান অবহেলার কারণ কী?, ১৫ নভেম্বর ২০২৪

74 বিডিনিউজ২৪, উত্থানকালে আহত বিক্ষোভকারীরা জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে হামলা চালিয়েছে, ৯ জুলাই ২০২৫।

75 দ্য ডেইলি স্টার, স্নিগ্ধ জুলাই ফাউন্ডেশনের সিইও পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন, ৯ মে ২০২৫

76 ওএইচসিএইচআর সত্য-অনুসন্ধান প্রতিবেদন, প্যারা ২৬৩।

77 বাংলানিউজ২৪, জুলাইয়ের শহীদ পরিবারগুলো মাসে ২০,০০০ টাকা ভাতা পাবে, ২৬ জুলাই ২০২৫

প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, এই স্কিমটি বুরোক্রাটিক বিলম্বে জর্জরিত, যা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হতাশা ও প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছে।[78] নভেম্বর ২০২৫-এ আহতদের আন্দোলনের পর অন্তর্বর্তী সরকার নিশ্চিত করে যে, আহত ব্যক্তিদের আজীবন বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হবে—সরকারি পরিচয়পত্রের মাধ্যমে।[79] ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ সরকার জানায়, আহতদের ক্ষতিপূরণ তিন স্তরের ক্ষতির শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে[80] এবং একই মাসে প্রথম কিস্তির অর্থ বিতরণ শুরু হয়। [81]জুন ২০২৫ নাগাদ সরকার জানায়, ৬৩০টি নিহত পরিবার ক্ষতিপূরণ পেয়েছে, ৯৫,৩৯৩ জন চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেছে এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে।[82]

অন্যান্য ক্ষতিপূরণ উদ্যোগ

অন্তর্বর্তী সরকার নিহতদের স্মরণে খেলার মাঠ ও স্টেডিয়ামের নামকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং বিক্ষোভের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি 'অভ্যুত্থান অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করেছে।[83]

ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারগুলো এসব উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে; তবে এসব কর্মসূচির বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করছে সময়োপযোগী, স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাস্তবায়নের ওপর। আইনি ভিত্তি ও ধারাবাহিক বাস্তবায়ন ছাড়া এসব সীমিত অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতার একটি বিস্তৃত ও টেকসই কাঠামোর অংশ না হয়ে কেবল প্রতিক্রিয়াশীল উদ্যোগ হিসেবেই বিবেচিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা করেনি বা ভুক্তভোগীদের প্রতি রাষ্ট্রের দায় স্বীকার করেনি; তদুপরি, সন্তুষ্টি (satisfaction) সম্পর্কিত অন্যান্য কোনো ব্যবস্থার ঘোষণাও দেওয়া হয়নি।

78 দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, জুলাই–আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের ভিকটিমদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি জানাল জাতীয় নাগরিক কমিটি, ২৯ নভেম্বর ২০২৪।

79 ঢাকা ট্রিবিউন,আহত বিক্ষোভকারীরা ৬ জন উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের দাবি পেশ করেছেন, ১৪ নভেম্বর ২০২৪।

80 ঢাকা ট্রিবিউন, জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে আহতদের জন্য নির্ধারিত শ্রেণিগুলো কী?, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

81 ঢাকা ট্রিবিউন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের পরিবার ও আহতদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া শুরু করেছে সরকার, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

82 বাংলাদেশ নিউজ গেজেট, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ভিকটিম ও পরিবারগুলোর জন্য সরকার ২৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, ৬ জুন ২০২৫।

83 ওএইচসিএইচআর সত্য-অনুসন্ধান প্রতিবেদন, প্যারা ২৬৪।

ভুক্তভোগীদের পরিস্থিতি

জুলাই ২০২৪-এর বিক্ষোভে নির্যাতনের শিকার হয়ে যারা বেঁচে আছেন, তারা এখনো গুরুতর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি। সহিংসতার অভিঘাত তাদের দৈনন্দিন জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।[84] সামগ্রিকভাবে, সরকার আহতদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ বা সমন্বিত পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে যে মাত্রার মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, তা অনুপস্থিত।[85]

কিছু ভুক্তভোগী বর্তমান ব্যবস্থার প্রতি ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, কারণ এটি মূলত (এবং অপর্যাপ্তভাবে) আর্থিক ক্ষতিপূরণের ওপর নির্ভরশীল এবং পুনর্বাসনের ওপর প্রায় কোনো গুরুত্ব দেয় না।[86] এই পদ্ধতি তাদের প্রকৃত চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক ভুক্তভোগী ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি; তাদের কাজ করতে অক্ষমতা পরিবারগুলোর ওপর মারাত্মক আর্থিক চাপ সৃষ্টি করেছে এবং দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তা আরও তীব্র করেছে।

বিক্ষোভে প্রাপ্ত শারীরিক আঘাত এখনো বহু ভুক্তভোগীর স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করছে। একই সঙ্গে পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (PTSD), উদ্বেগ ও বিষণ্নতার মতো মানসিক আঘাত ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।[87] পর্যাপ্ত মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা ও পুনর্বাসন সেবার অভাব তাদের সুস্থ হয়ে সমাজে পুনঃএকীভূত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং চিকিৎসা ও মানসিক সেবাসহ সমন্বিত পুনর্বাসনমূলক ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার জরুরি প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্ট করে তুলছে।

জবাবদিহিতা ও ক্ষতিপূরণ অর্জনে ভুক্তভোগীদের সম্মুখীন চ্যালেঞ্জসমূহ

বিক্ষোভ চলাকালে সংঘটিত লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়ে ভুক্তভোগী ও নাগরিক সমাজের অংশীদাররা সাধারণত দৃঢ় আগ্রহ প্রকাশ করলেও, বাস্তবে তারা গুরুতর আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন।[88] উদাহরণস্বরূপ—

ক) বিচারব্যবস্থা "রাজনীতিকীকৃত… এবং দুর্নীতি, রাজনৈতিক চাপ ও ভয়ভীতির ঝুঁকিপূর্ণ"—যা অনেক ভুক্তভোগীকে সরাসরি আইনি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে নিরুৎসাহিত করে এবং ন্যায়বিচার চাইবার আগ্রহে শীতল প্রভাব সৃষ্টি করে।[89]
খ) পুনরায় ভুক্তভোগীকরণের ঝুঁকি, পাশাপাশি আইনি প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে এবং তা কীভাবে অনুসরণ করতে হয়—এ বিষয়ে বিভ্রান্তি। অনেকেই মামলা প্রত্যাহারের জন্য হুমকি বা আর্থিক প্রলোভনের মুখে পড়েন, আবার রাজনৈতিক দল-সম্পৃক্ত আইনজীবীদের চাপেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলায় বহু ব্যক্তিকে জড়ানোর চেষ্টা দেখা যায়।[90]
গ) সাক্ষী সুরক্ষা আইন ও কার্যকর সাক্ষী সুরক্ষা আদেশের অভাব ভুক্তভোগীদের সরাসরি আইনি সহায়তা নিতে অনীহা সৃষ্টি করে এবং তাদের মানসিক চাপ আরও বাড়িয়ে তোলে।
ঘ) জরুরি সহায়তার কিছু ব্যবস্থা থাকলেও, দেশীয় পর্যায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণ কাঠামোর অনুপস্থিতি এখনো বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে।
ঙ) আদালতের দীর্ঘসূত্রতা এবং প্রদত্ত রায়ের বাস্তবায়নের ঘাটতি।
চ) বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণের ধারণা সম্পর্কে ব্যাপক ভুল বোঝাবুঝি বিদ্যমান। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ, এমনকি অনেক ভুক্তভোগী ও নাগরিক সমাজ সংগঠনও ক্ষতিপূরণকে কেবল আর্থিক ক্ষতিপূরণের সঙ্গে সমার্থক হিসেবে দেখে। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরিসর সীমিত করে, কর্মসূচি নকশায় ভুক্তভোগীদের অর্থবহ অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত করে এবং পুনঃস্থাপন, সন্তুষ্টি ও পুনরাবৃত্তি রোধের নিশ্চয়তার মতো অন্যান্য ক্ষতিপূরণ রূপ দাবি করার সম্ভাবনাও কমিয়ে দেয়।[91]

84 দ্য ডেইলি স্টার, জুলাই ২০২৪ গণবিক্ষোভে বাংলাদেশে আহতরা | গুলিবিদ্ধ 'জুলাই বীর'রা লড়ছেন কঠোর নতুন বাস্তবতার সঙ্গে, ৩ ডিসেম্বর ২০২৪।
85 টিআইবি নির্বাহী সারসংক্ষেপ, ২০২৫, পৃষ্ঠা ৬৪।
86 ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ রিড্রেসের কাছে দাখিল করা প্রতিবেদনসমূহ।
87 ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ রিড্রেসের কাছে দাখিল করা প্রতিবেদনসমূহ।
88 ওএইচসিএইচআর সত্য-অনুসন্ধান প্রতিবেদন, প্যারা ৩৬৭–৩২৫।
89 Ibid., প্যারা ৩২৩।
90 উদাহরণস্বরূপ দেখুন: অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলার উদ্বেগজনক ধারা, ৬৫ আগস্ট ২০২৫। দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, উত্থানের এক বছর পর: মিথ্যা মামলা ও গণঅভিযোগ জুলাই হত্যাকাণ্ডে ন্যায়বিচারকে হুমকির মুখে ফেলছে, ৬৬ আগস্ট ২০২৫।
91 ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ রিড্রেসের কাছে দাখিল করা প্রতিবেদনসমূহ।

বর্তমানে, উপরে উল্লেখিত কারণে, ভুক্তভোগীরা নির্যাতনবিরোধী কমিটি (CAT), জোরপূর্বক গুম সংক্রান্ত কমিটি (CED) কিংবা জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটির মতো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ব্যবস্থার ব্যক্তিগত অভিযোগ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আশ্রয় নিতে পারছেন না।

সম্মিলিতভাবে এসব প্রতিবন্ধকতা জবাবদিহিতার জন্য এক বৈরী পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করে।

উপসংহার ও সুপারিশসমূহ

জুলাই ২০২৪-এর বিক্ষোভ ও তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশে নির্যাতনের শিকারদের জন্য ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে একটি সমন্বিত, ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক পদ্ধতির জরুরি প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। তবু ভুক্তভোগীরা এখনো ক্ষতিপূরণ অর্জনের পথে গুরুতর ঝুঁকি ও বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। আমরা বাংলাদেশকে লক্ষ্যভিত্তিক সংস্কার গ্রহণের আহ্বান জানাই, যা ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার জোরদার করবে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বাধ্যবাধকতা পালনে সহায়ক হবে। প্রধান সুপারিশগুলো হলো—

ক) রাষ্ট্রের উচিত বিদ্যমান আইনসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করা এবং নির্যাতনের মামলায় পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণের বিধান প্রণয়ন করা—যার মধ্যে সন্তুষ্টি, পুনরাবৃত্তি রোধের নিশ্চয়তা, পুনঃস্থাপন ও পুনর্বাসন (প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসহ) অন্তর্ভুক্ত থাকবে; পাশাপাশি ক্ষতির মাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থিক ক্ষতিপূরণও নিশ্চিত করতে হবে। এই পর্যালোচনায় ভুক্তভোগী, নাগরিক সমাজ সংগঠন, OHCHR এবং অন্যান্য অংশীজনের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা উচিত।

খ) জুলাই/আগস্ট ২০২৪-এর ঘটনায় সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন—যার মধ্যে নির্যাতন, জোরপূর্বক গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও যৌন সহিংসতা অন্তর্ভুক্ত—কার্যকরভাবে তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের উচিত OHCHR-এর ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্টে সুপারিশকৃত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা। এর মধ্যে প্রমাণ সংরক্ষণ, সাক্ষী সুরক্ষা কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা এবং দায়মুক্তির মতো প্রতিবন্ধকতা অপসারণ অন্তর্ভুক্ত।[92]

গ) নির্যাতনের শিকারদের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের যে প্রক্রিয়াই থাকুক (বিচারিক বা প্রশাসনিক), রাষ্ট্রের উচিত নিশ্চিত করা যে—

i. সেগুলো ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক, পর্যাপ্ত অর্থায়নসম্পন্ন, স্বাধীন, নিরপেক্ষ, ন্যায্য ও স্বচ্ছ;

ii. অধিক ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর জন্য ভিন্নতাভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সেগুলো সহজলভ্য ও সাংস্কৃতিকভাবে উপযোগী;

iii. বিশেষত যৌন সহিংসতার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ার সব ধাপে লিঙ্গ-সংবেদনশীল পদ্ধতি অনুসরণ করা;

iv. স্বাধীন চিকিৎসকদের দেওয়া চিকিৎসা-প্রমাণ (সম্ভব হলে ইস্তাম্বুল প্রোটোকল অনুসারে) বিবেচনায় নেওয়ার সক্ষমতা থাকা; এবং

v. সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের (বিচারক ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদেরসহ) ইস্তাম্বুল প্রোটোকল বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা।

ঘ) রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলোর উচিত পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণের ধারণা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণের পরিপূরক ব্যবস্থা—যেমন সন্তুষ্টি, পুনঃস্থাপন, পুনরাবৃত্তি রোধের নিশ্চয়তা ও পুনর্বাসন—এর গুরুত্ব তুলে ধরা; যা ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণ এবং টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা—উভয়ের জন্যই অপরিহার্য।

ঙ) অন্তর্বর্তী সহায়তা প্রদানের বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলো (উপরে আলোচিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়াসহ) আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা—তা রাষ্ট্রের নিশ্চিত করা উচিত; বিশেষত লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা, অগ্রাধিকার নির্ধারণের স্পষ্ট নিয়ম, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া এবং দুর্নীতির ঝুঁকি প্রতিরোধ ও মোকাবিলার নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

92 ওএইচসিএইচআর সত্য-অনুসন্ধান প্রতিবেদন, প্যারা ৩৩৭–৩৪৬ এবং ৩৪৪।

চ) নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন-এর অধীনে বিদ্যমান ক্ষতিপূরণের সর্বোচ্চ সীমা অবিলম্বে পর্যালোচনা করে ক্ষতির মাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা উচিত।

ছ) নির্যাতনের শিকারদের ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় সাক্ষ্য প্রদানকারীদের সুরক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী সাক্ষী সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত।

জ) ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সব ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা উচিত—তা বিচারিক হোক বা প্রশাসনিক। বিচারকদের ক্ষেত্রে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে: নিয়োগ, বরখাস্ত, অপসারণ ও শৃঙ্খলাবিষয়ক কার্যক্রমে একটি প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা; ভয়ভীতি ও হয়রানি থেকে সুরক্ষা; রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও দুর্নীতিসহ অনুচিত প্রভাব প্রতিরোধ; এবং অবসর বা মেয়াদশেষ পর্যন্ত পর্যাপ্ত বেতন ও নিশ্চিত চাকরির মেয়াদ।

ঝ) জুলাই/আগস্ট ২০২৪-এর অপরাধে দায়ী ব্যক্তিদের সম্পদ জব্দ ও পুনরুদ্ধারের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেসব সম্পদ ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক ক্ষতিপূরণ কর্মসূচিতে ব্যবহারের নিশ্চয়তা দিতে হবে। এর জন্য আর্থিক তদন্ত সক্ষমতা দ্রুত জোরদার করা, সীমান্তপারের সম্পদ অনুসন্ধানে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় বৃদ্ধি করা এবং উদ্ধারকৃত অর্থ কেবল ভুক্তভোগীদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য স্বচ্ছ ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। সম্পদ লোপাট বা গোপন প্রতিরোধে এসব পদক্ষেপ বিলম্ব না করে গ্রহণ করতে হবে, যাতে সময়োপযোগী ও অর্থবহ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা যায়।

ঞ) রাষ্ট্রের উচিত CAT, CED, জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি এবং অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক সংস্থার এখতিয়ার গ্রহণ করা, যাতে তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত ব্যক্তিগত অভিযোগ শুনানি করা যায়।

কভার ছবিঃ রায়হান৯ (CC by 4.0)
বাংলাদেশ কোটা সংস্কার আন্দোলন ২০২৪

redress.org

REDRESS
+44 (0)20 7793 1777
info@redress.org

REDRESS
redresstrust

Ending torture, seeking justice for survivors